ড. জাহিদুর রহমান

৫ অক্টোবর ২০২২

আমি ড. জাহিদুর রহমান, আমার জন্ম বাংলাদেশে, ১৯৭৭ সালের ৩০ নভেম্বর। রাতে অনেক সময় ২টা পর্যন্ত অন কলে থাকতে হয়, তারপরেও আমার সকাল হয় খুব ভোরে, অ্যালার্মের শব্দে। অজু করে নামাজ পড়ে তৈরি হই, আমাদের তিন বাচ্চাকে উঠিয়ে ওদের তৈরি করি, আমার স্ত্রী মাখদুমা ওদের নাশতা তৈরি করে দেন। কখনো আমি ওদের নাশতা দিই, মাখদুমা তৈরি করেন, কখনো আবার উল্টোটা। তারপর ওদের তিনজনকে আমরা তিন স্কুলে নিয়ে যাই। আমার বড় ছেলে ইয়াশফিনের বয়স বারো, খুব বুদ্ধিমান বাচ্চা, গীটার বাজায়, ও ল্যাংলি স্কুলে পড়ে। এরপর মেয়ে ইউসরা মুনতাহা, নরউইচ স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে, ইন্টারনেট দেখে চমৎকার নাচ তুলতে পারে। সবচেয়ে ছোট মেয়ে আরওয়া মুসাররাত, সাড়ে চার বছর বয়স, ক্রিংগলফোর্ডে রিসেপশনে যায়। আমরা ওদের নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। প্রাইমারি স্কুল তো বাড়ির কাছেই, ফলে স্কুল বাদে বাকি সময়টা বাড়িতে ওরা আমাদের ব্যস্ত রাখে। এমনিতে ওরা খুব বাধ্য, মিষ্টি ছেলেমেয়ে। ওদের মা ওদের একটু শাসন করে, আমি তো তেমন শাসন করি না। ফলে ওরা বাবার দিকেই বেশি ঘেঁষা। হাসপাতালে কাজে গেলে ছেলে ইয়াসফিন তার ছোট্ট মোবাইল ফোন থেকে প্রায়ই টেক্সট করে—বাবা আমি তোমাকে মিস করছি। তখন হাসপাতালের কাজে মন দেয়া সত্যিই বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বাড়ি এলেই ছেলেমেয়েরা আমাকে ঘিরে ধরে, আমি যা বলি তাই শোনে।

আমি পেশায় ডাক্তার। আমার স্কুল-কলেজ জীবন খুলনাতেই কেটেছে, পরে চট্টগ্রামে চলে গেলাম ডাক্তারি পড়তে। ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে আমার মেডিক্যালের পড়ালেখার শুরু। ছয় বছর মেডিক্যাল কলেজে পড়ালেখা শেষ করে ঢাকায় আসি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করতে। সেখানে ফেলোশিপের দুই পার্ট শেষ করার পর সৌদি আরবে ইমারজেন্সি মেডিসিনে স্কলারশিপ পাই। ততদিনে আমার বিয়ে হয়েছে, বিয়ের এক মাস পরেই দুজন মিলে সৌদি আরব চলে যাই। এরপর সৌদি আরবে ইমারজেন্সি মেডিসিনে ফেলোশিপ সম্পন্ন করি। ২০১১তে আমি যুক্তরাজ্য আসি, প্রথম চাকরি নিই রমফোর্ডে কুইনস হাসপাতালে। ওটা ছিল নন-ট্রেনিং জব। ওখানে সাত মাস কাজ করার পরে ক্যারিয়ারের সুবিধা হবে ভেবে ট্রেনিং-এ ইপসউইচ আসি, ইপসউইচ তখন হায়ার স্পেশাল ট্রেনিং-এর জন্য উপযুক্ত। আমার জন্য ছিল তিনটা হাসপাতাল, ইপসউইচ, নরউইচ জেমস পেজেট আর কিংস লিন হাসপাতাল। পরে নরউইচের ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে আসি ২০১২তে, একে একে ট্রেনিং ইত্যাদি সবকিছু শেষ করি। ২০১৭তে ইমারজেন্সি মেডিসিনে কনসালটেন্ট হই, এখন অ্যাকিউট মেডিসিনে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি।

আমার বাবা ২০০৭এ মারা গেছেন। মা বেঁচে আছেন, শারীরিকভাবে কর্মক্ষম আছেন, একাই নিজের সব কাজ করতে পারেন। তবে বয়সের সাথে সাথে মানসিকভাবে একটু দুর্বল

হয়ে পড়েছেন। হয়তো আমি বাইরে থাকি সেটাও একটা কারণ। আমার ভাইরা উনার দেখভাল করেন। মায়ের অভাব আমি পদে পদে অনুভব করি। আমরা পাঁচ ভাই দুই বোন, আমি সবার ছোট। আমার বড় ভাই আব্দুল হান্নান শেখ, ইউএনডিপিতে পার্ট-টাইম কাজ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বেইজিং ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অভ অ্যামস্টার্ডামের চৌকস ছাত্র ছিলেন, পিএইচডি করেছেন। মেজ ভাই আব্দুস সোবহান শেখ ব্যাংকার এবং উকিল, ইসলামী ব্যাংকের উঁচু পদে কাজ করতেন, পরে আল আরাফা ব্যাংকে চলে গেলেন, গত মাসে তিনি অবসর নিয়েছেন, ওকালতিতে আবার ফেরত যাবার কথা ভাবছেন এখন। সেজ ভাই আব্দুল ওয়াদুদ শেখ খুলনা সিটি করপোরেশনের বাজেট এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। এরপরের ভাইও ব্যাংকার, খুলনায় ইস্টওয়েস্ট ব্যাংকে কর্মরত আছেন। দুঃখজনকভাবে, এই ভাই কয়েক বছর আগে ব্রেইন স্ট্রোক করেছিলেন, ফলে এখন তিনি বেশ দুর্বল, ডান হাত আর ডান পা ব্যবহার করতে পারেন না। বোনদের নাম হেলেনা পারভিন আর তসলিমা, তাঁরা খুলনায় নিজ নিজ সংসার নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

স্কুলজীবনে একবার পিকনিকে গিয়ে আমি আর আমার এক বন্ধু পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিছুতেই কেউ আমাদের খুঁজে পাচ্ছে না, আমরাও পথ খুঁজে পাচ্ছি না। দুই দিন হয় আমরা ঘরের বাইরে। পরে সবাই আমাদের খুঁজে পেল। সেটা বেশ মজার স্মৃতি। স্কুলের বন্ধুদের চেয়ে বরং মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে এখন বেশি দেখা হয়। এবার বাংলাদেশে গিয়ে আট দশজন বন্ধু মিলে সপরিবারে গাজীপুরে একটা রিসোর্টে থাকলাম। অত্যন্ত আনন্দ করলাম। ফেসবুকের সুবাদে বন্ধুদের সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। যুক্তরাজ্যে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের অ্যালামনাইদের একশোজন ডাক্তারের একটা বড় জোট রয়েছে, সেখানে সিনিয়র ও জুনিয়র সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। কয়েকদিন আগেই অ্যালামনাইদের তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হলো লন্ডনে। আমরা যে যার পরিবার নিয়ে গেছি, হোটেলে থেকেছি। প্রথম দিন ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার, এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গালা ডিনার। তৃতীয় দিন ছিল পিকনিক।

পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমার আর মাখদুমার প্রথম দেখা হয়। এরপর ব্যক্তিগতভাবেও কয়েকবার দেখা হয়, একে অপরের প্রতি ভালোবাসার টান অনুভব করি। পরিবারের সম্মতি ছাড়া তো আমাদের সামনের পথ মসৃণ হবে না, এদিকে বাঙালি পরিবার নিজেদের পরিচয়ের বিয়েকে খুব ভালো ভাবে নেয় না, বাধা আসে। ফলে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিই মাহদুমার ভাইদের বোঝাতে হবে। ওঁদের সম্মতি পাবার পর আর তেমন কোনো পারিবারিক বাধা থাকেনি, আমরাও সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। বিয়েটা যখন হলো তখন আমাদের দেশের বাইরে ভালো চাকরির প্রস্তাব এসেছে, সেখানে পরিবারের কেউ নেই। ফলে বিয়ে করেই আমরা সৌদি আরবে আমাদের প্রথম সংসার পাততে চলে গেলাম। আমাদের বিবাহিত জীবনে সুখের ঝগড়া দুঃখের ঝগড়া সবই আছে, তবে ঝগড়া বেশিক্ষণ আলাদা রাখতে পারে না আমাদের, আবার মিশে যাই। ঝগড়া ধরে রাখতে পারি না কারণ খিদে লাগলে তো উপায় থাকে না, তাঁকেই অনুরোধ করতে হয় কিছু রান্না করার জন্য।

এখানে যখন প্রথম এলাম, তখন কাউকে চিনতাম না। ডক্টর তারেকের পরিবার ছাড়া আর কোনো বাঙালি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। ধীরে ধীরে পেশাগত কারণে আমাদের সঙ্গে অনেকের পরিচয় হলো, সমাজেও মিশলাম। এখন আমরা অনেককে চিনি, বেশ আনন্দে হইহুল্লোড় করে নরউইচে আছি।